দ্বিতীয় বর্ষ

৬ ও ৭ জানুয়ারী ২০০৭

নবনগর - বিবেকানন্দ ময়দান, শক্তিগড়, যাদবপুর

সম্পাদকীয়

বাড়ির কাছে আর্শিনগর

মারফৎ আয়োজিত বাউল ফকির উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ!

বছর ঘুরে গিয়ে যখন উৎসবের তোড়জোড় চলছে জোর কদমে, মানে প্রায় শিরে সংক্রান্তি, তখন একটু পেছন দিকে তাকানোর দরকার হয়ে পড়ল। কিছুটা সংগঠনের তরফে সকলের কাছে একটি মানানসই বয়ান তুলে ধরার জন্য আর কিছুটা হল - সত্যি সত্যিই কি ঘটেছে, মানে আমরা এই এক বছর ধরে ঠিক কি করেছি বা করার চেষ্টা করেছি তা জানানোর জন্য। আদৌ কিছু হবে এরকম কোনো দিশা পাচ্ছি - নাকি পৌষের শীতে গানে গানে দু-দুটো দিন মশগুল থাকবার আর একটা বাৎসরিক হুজুগ - সেই সব খানিক খতিয়ে দেখার একটু প্রচেষ্টা।

প্রথম বার উৎসবের আয়োজন ছিল নেহাতই কিছুটা আইডিয়া নির্ভর। আরো পাঁচটা উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে অনেকের সাথে মিলে মিশে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত সময়বন্দী নির্মল ফন্দি-ফিকিরের একটা রকমফের। যা কিনা অনেকের কাছেই পরে মনে হয়েছিল একটা দারুণ ব্যাপার হোল। নেহাৎ কম মানুষজন জমেনি। আর কিছুজন তো ভাবের গানে দারুণ মজেই গেছেন। মজে হয়তো ছিলেনই তাঁরা আগের থেকে, এই উৎসব তাতে খানিক বাড়তি ইন্ধন জুগিয়েছে মাত্র। মনের মত হয়তো নয়, তবু তার কাছাকাছি কিছুটা - গান ঘিরে মানুষজন - নাকি মানুষজন ঘিরে গান - হয়তো দুটিই কম - বেশি মিশিয়ে এক ধরনের আবর্ত যে তৈরী হয়েছে উৎসব পরবর্তী সময় জুড়ে সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। যদিও মারফৎ-এর নামে এই উৎসবের আয়োজন হয়েছিল, মারফৎ-এর সদস্য নয় বা তার অন্যান্য কাজকর্মের সঙ্গে কোনোরকমভাবে জড়িত নন এমন অনেক মানুষজনই এই উৎসব প্রসঙ্গে নানাভাবে জানতে চেয়েছেন পরে কি হচ্ছে, পরের বারে আমাদের উৎসবের আয়োজন হচ্ছে তো ঠিকঠাক? অর্থাৎ উৎসবটা ঠিক মারফৎ-এর একার নয়, কোনো একটা সংগঠনের নয়, হয়ে উঠেছে অনেকের। মারফৎ হয়তো খানিকটা ছাতা বা মঞ্চর মত ভূমিকা নিয়েছে মাত্র। এটাও হয়তো ঘটনা, শহুরে যাঁরা এই গানে ভাবে মজেছেন তাঁদের মধ্যে একটা যোগসূত্র বিভিন্ন মেলা আর অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বোধহয় এমনিতেই গড়ে ওঠে। বাউল-ফকির গান ঘিরে গ্রামীণ মেলার বা বড় কোনো উৎসবের মধ্যে লোকের হারিয়ে যাওয়ার অবকাশ থাকে প্রচুর, যার ঠিক উল্টোটা শহরের সময় মেপে বদ্ধ হলের অনুষ্ঠান। হয়তো এ-দুইয়ের মাঝামাঝি কিছু একটা এই উৎসবে ঘটেছে।

উৎসবের পরে ঠিক নিয়ম করে না হলেও প্রথম কয়েক মাসে কলকাতায় কয়েকটি ছোটখাটো ঘরোয়া আসর, নানা মেলায় কমবেশি যাতায়াত, কিছু কিছু আখড়ায় যাওয়া আর সর্বোপরি

'মোবা(উ)ল' অব্যাহত রেখেছে পারস্পরিক যোগাযোগকে, যুক্ত করেছে গায়ক-শ্রোতা দু-তরফের নতুন নতুন মুখ। মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে আয়োজিত একদিনের উৎসবে সম্বর্ধনা জানানো হয় লোকমান ফকিরকে। আর এই সমস্ত (অ) কাজের মধ্যে দিয়ে মারফৎ এর বন্ধুবৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে স্বারোপিত দায়িত্ব। তার মধ্যে একটা অবশ্যই নানান ঝক্কিকে খুব একটা তোয়াক্কা না করে দ্বিতীয় বার উৎসবে ঝাঁপিয়ে পড়ার। গান শোনার আয়োজনের পাশাপাশি গানগুলিকে যন্ত্রবন্দী করা এবং আরো অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে চিন্তা ছিল সে সব খুব পরিকল্পিতভাবে না হলেও কিছুমাত্রায় ঘটেছে। গত বছরের গানের একটি সংকলন এ বছর উৎসবে প্রকাশ করা হচ্ছে। এর জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ মৌসুমী আর সুকান্তর কাছে।

ধন্যবাদ দিয়ে কাউকে আলাদা করে বলার সত্যিই কিছু নেই, কেননা সকলেই যা করেছেন এত আন্তরিকতার সঙ্গে যে ধন্যবাদ জানানো সেখানে বাতুলতা। তবু উল্লেখ করতে হয় নবনগর কলোনী কমিটিকে যাঁদের সহায়তায় সত্যিই চেনা খেলার মাঠ উৎসবে রূপান্তরিত হয় নব নগরে।

পরিশেষে একটা কথা বলার থেকেই যায়, আমাদের মত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাদের পুঁজি মূলত শুভানুধ্যায়ীদের সহায়তা, এই উৎসব শুধু নয়, আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ করার যে ইচ্ছা পোষণ করি সেখানে অর্থেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। গত আর্থিক বছরে এই উৎসবে এবং গান সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে শিল্পীদের সাম্মানিক বাবদ ৪০ হাজার, তাদের খাওয়া-থাকা এবং যাতায়াত বাবদ ৩৫ হাজার টাকা আর ২০ হাজার টাকা মত লেগেছে রেকর্ডিং ইত্যাদির জন্য। এছাড়া আলো, শব্দ, প্যান্ডেলের খরচ তো আছেই। স্বাভাবিকভাবে এ বছরে আরো অনেকটা বেশীই লাগবে। আর সত্যি বলতে তত্ত্বাবাস্তব, নানা মুনির নানা মত, নিজেদের অনভিজ্ঞতা মিলিয়ে অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মত এই উৎসব সেভাবে বাণিজ্যিক বা অন্য কোনো সংস্থা থেকে সেভাবে সহায়তা আদায় করতে পারেনি। শাপে বর কি না জানিনা, তবে এর ফলে উৎসব পরিচালনার বিষয়টি সত্যি সত্যিই একান্তভাবে পাড়া-পড়শি, বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী আর সংগীত প্রেমীদের সামগ্রিক প্রয়াসের ওপর আস্থা রেখেই এ বছরের উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নগর বাউল হয় কি না জানা নেই, আর শহুরে আখড়ার ধারণাও খুব অস্পষ্ট, তবে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে সকলকে নিয়ে যে একটা ধারণা থেকে শুরু করে তা সত্যিই ক্রমশঃ একটা উৎসব হয়ে উঠছে এ এক দুর্লভ প্রাপ্তি।

এই অশান্ত সময়েও দুদন্ড সকলে মিলে আনন্দলহরীতে থাকবেন - এই আশা জিইয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব আমাদের সকলের। শিল্পী-সাধকরা কিন্তু আপনাদের ওপর অনেকটাই আস্থা এবং বিশ্বাস রেখেছেন। গত উৎসবে সনাতন দাস বাউল বলেছিলেন - এখানে যাদবপুরে একটা ডাল পুঁতে গেলাম, যত্ন করিস মহীরূহ হবে। যত্নের দায় আর বিচারের ভার সকলের ওপর দিয়ে আপাততঃ মনোনিবেশ করা যাক উৎসবের দুটো দিনের দিকে।

মারফতের উৎসব

একটি আরবান আখড়া

সুরজিৎ সেন

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর বাঙ্গালা ভাষার অভিধান-এ 'আখড়া' শব্দটির অর্থ লিখছেন ১. আড্ডা ২. পাঠশালা ৩. সাধু-সন্ন্যাসীর সাধন ভজনের স্থান ৪. সাধুদিগের সাম্প্রদায়িকমণ্ডলী ৫. নৃত্যগীতবাদ্যাদির আলোচনার স্থান।

ফকির-বাউলদের জীবনচর্যায় আখড়া একটি অপরিহার্য আশ্রয়। যাঁদের বাউল-ফকিরদের মেলায় ঘোরার অভ্যাস আছে, তাঁরা আখড়া দেখেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের অনেকেরই আখড়ায় দু'দন্ড বসা কি দু'একদিন কাটানোর অভিজ্ঞতাও হয়েছে। মেলা উপলক্ষে বহু মানুষের আসা-যাওয়া-গান-কথা-ভাব-ভালবাসায় আখড়াগুলো এক একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারার মত জেগে থাকে মেলার আকাশে। এই মুহূর্ত্তে মনে পড়ছে পাথরচাপুড়িতে বশিরবাবার আখড়া, কেন্দুলিতে সুধীরবাবার আখড়া বা বেণীমাধবের আখড়ার কথা। যাঁদের নামে আখড়া, তাঁরা হয়তো আজ বেঁচে নেই, তাঁদের শিষ্য-অনুগামী-বংশধররা বাঁচিয়ে রেখেছেন আখড়াগুলো। কখনো পুরনো আখড়া উঠে যায়, নতুন আখড়া জন্ম নেয়।

মেলা যখন থাকেনা তখনো আখড়া জেগে থাকে প্রাণের আনন্দে। কোনো ফকির কি বাউল এমনই ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন আখড়ায়। হয়তো কাছাকাছি কোনো কাজে এসেছেন নয়তো কাজের একটা ছুতো আছে। কুশল বিনিময়ের পর একটা গান ধরলেন। হয়তো নতুন গান। গানের কথা নিয়ে আলোচনা হল, তার তত্ত্ব নিয়ে বোঝাপড়া হল। সে খোঁজ নিল চেনা কয়েকজনের। জানা গেল, কারোর দীর্ঘদিন কোনো খবর নেই, অমুক তো কাল আসবে। আখড়াধারী তাঁকে বললেন থেকে যেতে, সে থেকে গেল। আখড়ার আর্থিক অবস্থা ভাল হয় না। সেবা-দানে-মাধুকরীতে চলে আখড়ার অর্থনীতি, তাই আহার সামান্য, কিন্তু অন্তঃকরণ উজাড় করা প্রেম অসামান্য। কখনও কখনও আখড়াধারী কারোর হাতে দায়িত্ব দিয়ে নিজেই বেরিয়ে পড়েন। ফকির-বাউলরা ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়, সারা বছরই তাঁরা ঘুরছেন এক মেলা থেকে আরেক মেলায়, মেলা না থাকলে

কোনো গুরুর দিবসী বা সাধু সভা (গুরুর মৃত্যুদিন উপলক্ষে একদিন বা তিনদিনের মহোৎসব) উপলক্ষে এক আখড়া থেকে আরেক আখড়ায়। সব মিলিয়ে আখড়া হল গান - তত্ত্বকথা-সেবা-প্রেম-অভিমান-আনন্দর এক আশ্চর্য প্রাণঝর্ণা।

মানব সম্পর্কের এই মরমী প্রবহমান ঐতিহ্যটিকে মারফৎ তার সাধ্যমত ছুঁতে চায়। কেন? বিশ্বায়ন আর উন্নয়নের ডমরুধ্বনিতে শহরের ভূগোল-সংস্কৃতি-রাজনীতির পরিবর্তনের উর্দ্ধশ্বাস দৌড়ের মাঝে হাঁফ ফেলার জন্য আর নিজেদের এবং লোকশিল্পের শতাব্দী প্রাচীন ধারাটিকে এই সময়ের আয়নায় বুঝে নেওয়ার জন্য।

বাজার অর্থনীতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজের পরিচিত নকশাগুলো আর আগের মত থাকছে না। সেই তালে তাল দিয়ে মারফত আপ্রাণ চেষ্টায় আরেকটি নকশা তৈরি করতে চাইছে দুদিনের বাউল-ফকির উৎসবের মধ্যে দিয়ে - যাকে বলা যেতে পারে **আরবান আখড়া**। শুধু কি উৎসবের দুদিন? মারফতের সঙ্গে আমরা যারা জড়িয়ে আছি, আমরা সারা বছরই আখড়াটিকে মনে মনে পালন করে চলি। এসে পড়েন কোনো বাউল আমাদের কারোর বাড়িতে, একদিনের জন্য তার বাড়িটাই আখড়ার চেহারা নিল কিংবা আমরাই গিয়ে হাজির হলাম নদীয়া কি মুর্শিদাবাদের কোনো ফকির বাড়ি, শহরের আখড়া গিয়ে মিশল গ্রামের আখড়ায়।

এই লেখাটা লিখতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি যাঁর কথা মনে পড়ছে তিনি হলেন দীপক মজুমদার। গত শতাব্দীর আটের দশকের শুরুতে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে উনি হাজির হতেন সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত পবনদাস বাউল কি যুবক গৌরক্ষ্যাপা নয়তো সুবলদাস বাউলকে সঙ্গে নিয়ে। এর বাড়িতে একদিন, ওর বাড়িতে দুদিন - এইভাবে দিন দুই - তিনের একটি ভ্রাম্যমান আখড়া শহরে ঘুরে বেড়াত। ওঁর সঙ্গে জুটেছিলেন গায়ক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। তিনিও আজ আমাদের মধ্যে নেই।

গত শতাব্দীর সাংস্কৃতিক স্মৃতি, উত্তরাধিকার ও আরও অনেক কিছু সম্বল করে মারফত তার দ্বিতীয় উৎসব শুরু করতে যাচ্ছে অপারে কেউ থাকবে না এই আশায়, লালন যেমন তাঁর গানে বলেছেন।

লোকসংস্কৃতি বিলীন হয়ে যাবে : খালেদ চৌধুরী

(মারফৎ-এর পার্থ মজুমদারের সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতায় খালেদ চৌধুরী)

প্রথমেই যেটা জানতে চাইব যে লোকসঙ্গীত বা বিশেষ করে বাউল ফকির সঙ্গীতের সঙ্গে আপনার যোগাযোগটা কি ভাবে হয় ?

ছোটবেলায় আমরা যখন গান শুনতাম, তখন লোকসঙ্গীত বলে কোন বিভাজন ছিল না। লোকসঙ্গীত এবং মার্গ সঙ্গীতের বিভাজনটা ছিল না। সঙ্গীত সঙ্গীত ছিল। আমরা সবই শুনতাম - সবই করতাম। তার মধ্যে একটা বিভ্রান্তিকর ব্যাপার ছিল। যেটা পরবর্তীকালে পরিস্কার হয়। সেটা হচ্ছে গ্রামোফোন রেকর্ডের মধ্যে লেখা থাকত - পল্লীগীতি, গ্রাম্যগীতি, লোকগীতি, এখন - পল্লীগীতি, গ্রাম্যগীতি আর লোকগীতির সঙ্গে অন্য সংগীতের পার্থক্যটা কোন জায়গায়। এইটা যখন আমরা ১৯৬৫-এ কাজ করতে শুরু করি - Folk Music & Folk Lore Research Institute-করি - তখন এই বিভাজনটা পরিস্কার হওয়া দরকার মনে করলাম। ওটা - ওই বিভাজন রেখাটা আস্তে আস্তে আমাদের কাছে পরিস্কার হল। তার আগে কিন্তু পল্লীগীতি বলে কিছু ছিল না।

কলকাতা শহরে, বিভিন্ন পল্লীর নামে এক-একটা অঞ্চল ভাগ হত। এখন যেমন শ্যামবাজার এলাকা, বালীগঞ্জ এলাকা, ভবানীপুর এলাকা, এই যে বড় আকারে এলাকা ভাগ করা হয়। তার আগে কিন্তু পল্লী হিসাবে ভাগ করা হত। যেমন দুর্গাপুজার সময় দেখা যায় ২১ পল্লী, ২২ পল্লী, ২৩ পল্লী এইসব। তখন কলকাতা ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতিতে সম্পৃক্ত বলা যেতে পারে বা কিংবা প্রভাবিত। তখন কিন্তু শহরে - শহুরে সংস্কৃতিটা তৈরী হয় নি। শহরে যে সংস্কৃতিটা কলকাতায় চালু ছিল - খেউড়। তারপরে - সঙ, কিংবা কবিগান। বা ধর, আখড়াই - এই জাতীয় জিনিষ ছিল - এগুলো কিন্তু লোকসঙ্গীত ছিল। কিন্তু শহরের সংস্কৃতিটা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর গ্রামের থেকে সংস্কৃতিটা আলাদা হয়ে গেল। তখনই বিকৃতি এল। আর এসমস্ত হয়ে লোকসংস্কৃতি একেবারে লোপ পেয়ে গেল। যেমন কবিগান কিন্তু একটা সময় গ্রামীণ সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গেছে। কারণ শহরের সংস্কৃতি এসে শহর সংস্কৃতিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে - কিংবা গ্রামীণ সংস্কৃতি এসে এখানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিভাজনটা ওই জায়গাটায় শুরু হয় যখন শহর - শহুরে সভ্যতাটা খুব প্রকট হয়ে যায়। আলাদা একটা মাত্রা নিয়ে নেয়, এবং গ্রামীণ সভ্যতা বা গ্রামীণ সংস্কৃতি তার জায়গায় থেকে যায়। তখনই বিভাজনটা পরিস্কার হয়।

এতক্ষণ ধরে এই কথাগুলো বললাম এই কারণে যে বিভাজনটা রাখা দরকার। লোকসঙ্গীত বলতে বোঝা যায় যে গ্রামীণ মানুষ যারা প্রকৃতির পরিবেশে লালিত, প্রকৃতির পরিবেশ থেকে

শিক্ষিত এবং তার দ্বারা উজ্জীবিত তারা গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে। তাদের জীবনেও কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়, দেখা দেয় বা উঁকি দেয়। সেই সমস্ত গানের মধ্য থেকে নানা রকমের ধরন (ঢং) আছে। যেমন নাচের গান আছে, নৌকা বাইচ আছে - তারপর অন্যান্য নানারকমের গান আছে। যেমন ভাটিয়ালি বলতে গলে - ভাটিয়ালির যে structure নদীমাতৃক দেশ হওয়ার ফলে জলের ভাটির একটা factor আছে। কিন্তু ওটা একটা structure, এই structure টা হচ্ছে তার আরোহন অবরোহনের। তার একটা ধারা আছে। যখন বর্ষার সময়ে সমান্তরাল হয়ে যায় সমস্ত জায়গা তখন নৌকোটা ছেড়ে দিয়ে ভাটির দিকে চলতে গিয়ে গানটা ধরে তখন কোন তাল থাকে না।

এই যে গানের চলন - সেটাকেই পূর্ব বাংলায় ভাটিয়ালি বলা হত। কিন্তু ওই structure এই কিন্তু ধামাইল গান গাওয়া হয়। মেয়েদের ধামাইল গানটায় কিন্তু ছন্দটা আলাদা কিন্তু structureটা এক। ওটা ত্রিমাত্রিক ছন্দের। আবার ওই যে ভাটিয়ালি যে গানটা - যেটা বর্ষার সময় গাওয়া হয়, ওটা শীতকালে কিন্তু তালে গাওয়া হয়। এবং সেটা 'চালি'তে দিয়ে গাওয়া বলা হয়। 'চালি' মানে একটা চলনের মধ্যে আসা। ভাটিয়ালি গানের মধ্যে আমি ইচ্ছা মত বেশী করছি, কম করছি লম্বা টান দিচ্ছি। কিন্তু 'চালি'তে আমার ইচ্ছামত হচ্ছে না - ছন্দের মধ্যে সীমিত থাকছে - ত্রি মাত্রিক - চার মাত্রিক নানা রকম হতে পারে। এর আবার নানা রকম ঢং আছে - যেমন ময়মনসিং-এর ঢংটা ত্রিমাত্রিক দিয়ে শুরু করে চর্তুমাত্রিক দিয়ে শেষ করে। ওটা সিলেটেও তাই সিলেটের সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক দিয়ে শুরু করে চর্তুমাত্রিক দিয়ে শেষ করে।

তালফেরতা করে।

কিন্তু ওটা শীতকালে হয়। কেন না তখনকার যে ভূ-প্রকৃতি, সমান্তরাল জায়গা থেকে বদলে গিয়ে উঁচু নীচুতে এসে যায়। এটাই নির্ধারণ করে পুরো কাঠামো তখন সুরটা ওঠা নামা করে সেই জন্য এখানে অরনামেন্টটা বেশী আছে। ছন্দটা বেশী আছে - এই হলো গিয়ে ভাগ। এরপরে বিভিন্ন রকম আচার-অনুষ্ঠানে যে সমস্ত গান গাওয়া হয় বিয়ের - বা ব্রতর হতে পারে তার সবটারই structure ভাটিয়ালি। এটা পূর্ববঙ্গের কথা বলছি।

পূর্ববঙ্গ বলতে বোঝায় - সিলেট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল এই এলাকাটা জুড়ে কিন্তু চট্টগ্রামের মধ্যে একটু আলাদা ঢং আছে। ভাষার তফাৎ সুরের কাঠামোটা একটু নির্ধারণ করে। এই জন্য চট্টগ্রাম একটু আলাদা হয়ে যায়। এছাড়া আরেকটা হচ্ছে আরাকানের প্রভাবটা কিছুটা আছে. সে জন্য ভাটিয়ালির সঙ্গে ওটার মিশ্রণ আছে। ওই ভাটিয়ালি যখন সন্দ্বীপ অঞ্চলের - দিকে আসে নোয়াখালির তখন কিন্তু একটু বদলে যায়। এই যে বদলটা এই বদলটা কিন্তু লোকমনে চালু আছে। তার মানে এবং তার মধ্যে একটা স্তিমিত ব্যাপার আছে। তার মধ্যে বৈচিত্র্যটা কম কারণ ওদের লোক জীবনে বৈচিত্র্যটা কম। প্রতি বছর শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত একইরকম ঘুরে ঘুরে আসছে। তার ফলে তার চাষবাস সমস্ত কিছু সম্পৃক্ত। তার মধ্য থেকে

তার হতাশা, দুঃখ, বেদনা এগুলো বেরিয়ে আগে তার মধ্যে পরলোক চর্চাও বেরিয়ে আসে। এর সবটাই নিয়ে তার গার্হস্থ্য জীবন। আর তার মধ্য থেকে তাঁরা যে সৃষ্টিটা করেন ওইটিই হচ্ছে লোকসঙ্গীত।

এইবার বাউল- ফকির - যে প্রশ্নটা তুমি করলে, এরা কিন্তু সমাজের একটা অন্য অংশ - যারা শুধু অন্তজ জায়গা থেকে আসছে তাই নয় - ওরা একটা গোষ্ঠী - সাধক গোষ্ঠী। সাধক গোষ্ঠীর তার কিন্তু তন্ত্র আছে নিয়ম আছে - সেইটা অনুযায়ী তার কিছু গান রচনা করে যা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত থাকে। যে বাউল তত্ত্বটা আমাদের বাংলাতে সৃষ্টি হয়েছে বিশেষ করে রাঢ় বাংলাতে সেখানে কিন্তু বাউলের চর্চাটা হয়, কারণ এখানে এসে বৌদ্ধ সহজিয়া, তারপরে সুফী এবং বৈষ্ণব তিনটের সংমিশ্রণ হয়। এবং এই তিনটের মিশ্রণেই সৃষ্টি হয়েছে বাউল গান। ফকির তত্ত্বের মধ্যে সুফী প্রাধান্যটা বেশীই - তার সঙ্গে বাউলের মিশ্রণ আছে। ফকির গান হল মূলতঃ মারিফতি গান। মারিফত মানে হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। অর্থাৎ পরমাত্মা হচ্ছে আসল কথা। আমি ক্ষুদ্রাত্মা। ক্ষুদ্রাত্মার পরমাত্মায় গিয়ে লীন হয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে আলটিমেট এই সুফী দর্শনের। ওটা বাউলদেরও তাই, অনেকটা বৈষ্ণবদেরও তাই। কিন্তু তন্ত্রটা একটু আধটু আলাদা। কিন্তু কয়েকটা জায়গায় broader ক্ষেত্রে কিন্তু মিলে যায়। সেই যে জায়গাটায় মিলছে সেই জায়গাটায় কিন্তু বাউলরা একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত থাকে। তার সাধনতত্ত্ব আছে। যেগুলো আমরা ওদের গানের মধ্যে পাচ্ছি - ডবল মানে। একটা গভীর মানে কিন্তু ওরা নিজেরা বোঝে - ওটা বাইরে প্রকাশ করে না - আর আমাদের কাছে সেটা ধাঁধা লাগে শুনতে -

যেটা বাতুনে আছে....

হ্যাঁ। শুনলে মনে হবে প্রকাশ্যে সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য একটা মানে আছে। যেমন - 'বাঁকা নদীর পিছল ঘাটে পার হবি কি করে', এর একটা বাহ্যিক মানে আছে। এর মানেটা কিন্তু আলাদা। বাউলদের তন্ত্রসাধনায় এর আলাদা মানে আছে। ওদের আবার নিয়ম আছে - ওরা বিয়ে টিয়ে করে না, ওরা কন্ঠী বদল করে। সাধন সঙ্গিনী নেয় এবং ওদের নিয়ম হচ্ছে সন্তানাদি হবে না। তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাউল কিন্তু একটা জায়গায় শেষ হয়ে যাচ্ছে - হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আমরা - বর্তমান যুগে দেখছি বাউলদের সন্তানাদি হচ্ছে তার পিতৃপুরুষ এই ছিল - তার অমুক এই ছিল - তমুক এই ছিলো - অর্থাৎ তার ঘরানা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। চল্লিশের দশক পর্যন্ত একটা বাউলের পরিচিতিটা এরকমই ছিল।

চল্লিশের পর থেকে স্বাধীনতা আসার পর - দেশের একটা আইডেনটিটি দরকার ছিল। আইডেনটিটি অর্থাৎ আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি। কিছু শিক্ষিত সম্প্রদায় এইটার ওপর বেশী জোর দিল। একটা জাতে তোলার ব্যাপার আছে আর কি। বিদেশের কাছে দেখানো আমাদের এই জিনিসগুলো কি রকম, এইটা বলে বাউলদেরকে সামনে নিয়ে আসবার চেষ্টা করল এবং সেইটাকে আমাদের সংস্কৃতির একটা বড় জিনিস বলে দেখানো হলো। আসলে এটা নয়। বাউল সত্যিকার বলতে

গেলে আমাদের সংস্কৃতির একটা অংশ বিশেষ মাত্র। পার্শিয়াল লোকসঙ্গীত বলা যেতে পারে - লোকসঙ্গীত মানে যেহেতু এরা লোকজীবন থেকে উঠে এসেছে, যেহেতু লোকজীবনের সুর ওরা ব্যবহার করে, তাদের idiom ব্যবহার করে, আবার লোকের কাছে ফিরে যায় ভিক্ষের জন্য, সেই জন্য তার সঙ্গীতটা কিন্তু পার্শিয়াল এই পর্যন্ত। কিন্তু লোকজীবনের কথা তারা বলেনা কারণ সেটাকে তারা ব্যাঙ্গ করে।

যেই জন্য তারা লোকসঙ্গীতের থেকে নিজেদের ভিন্ন করে

হ্যা। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এটাকে এনে বিদেশের কাছে দেখানোর একটা জন্য commodity হিসেবে তাদের পেশ করল। ফলে ওরা corrupt হয়ে গেল। অর্থাৎ বাউল ফকির যারা তারা একটু corrupt হয়ে গেল। হয়ে গিয়ে বিদেশমুখী হয়ে গেল। আস্তে আস্তে তাদের রূপবদল হতে লাগল। গানের মধ্যে যেমন বাউল গানে typical বাউল যাকে বলা হয় তার চরিত্র এবং commercial বাউল-এর মধ্যে চরিত্রগুলির আকাশ পাতাল ভাগ হয়ে গেছে। সেই বাউলদের জীবনযাত্রাও বদলে গেছে। তাদের বাড়িতে গেলে টিভি পাওয়া যায়, টেলিফোন পাওয়া যায়, হেয়ার ড্রাইয়ার পাওয়া যায়। মানে বর্তমানে ওই যে 'যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না' নয় কিন্তু । 'রাঁধিব বাড়িব ব্যঞ্জন করিব তবু হাঁড়ি ছোঁব না', এই যে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হব না - আমরা সবকিছুতেই আছে কিন্তু বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি না সাংসারিক জীবনে, এই বাউল কিন্তু তারা নয় ... তারা রীতিমতো আবদ্ধ হয়ে আছে কাজেই সেটা বদলে গেছে কাজেই আমরা সেটাকে কোন দৃষ্টিতে দেখতে চাই ?

আমি যদি ভিতরে ঢুকতে চাই - তাহলে আমি কিন্তু শরীরটা পাব না কিন্তু আমি মানেটা বুঝতে পারবো - এই জিনিসটাই বলতে চেয়েছে এবং তার মধ্য থেকে দর্শনের কথা আছে যেগুলো দেখে রবীন্দ্রনাথও কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু এই corruption সত্ত্বেও ফকিররা বা বাউলরাও কিছু কিছু জায়গায় মৌলবাদীদের হাতে যথেষ্ট পরিমান নিগৃহীত হচ্ছে

সে তো হবেই, সেটা তো সব মৌলবাদেই হবে। আমাদের বাউলদের তো সমাজে কেউ খুব একটা ভালো চোখে দেখে না। গান শোনার সময় ঠিকই শোনে কিন্তু তাদের জীবনচর্চা তো গ্রহণ করবে না।

তার মানে একটা role এখনো ওঁরা play করছে...

তাতো বটেই। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ওটা residual আস্তে আস্তে ওটা merge করে যাবে। একটা সময় আসবে যখন ওটা merge করে যাবে। ওটা একটা item হিসাবে থাকবে। লোকসঙ্গীত একটা item হিসেবে থাকবে এবং সেটা পরিবর্তিত চেহারা পেয়ে যাবে। Europe-এ এটাই হয়েছে। লোকসঙ্গীত অর্থাৎ folk song এবং pop song সমার্থক হয়ে গেছে।

যাহাই লোকসঙ্গীত তাহাই popular সঙ্গীত এই ধরনের একটা ব্যাপার ওদেশে আছে। তার কারণটা হচ্ছে, industrialisation ভীষণভাবে হয়েছে। আর industrialised যেই হবে তার culture টা আলাদা তার চাহিদা আলাদা তার সমস্ত কিছু আলাদা হয়ে যাবে। অতএব সেটা inevitable যে আস্তে আস্তে গ্রামীণ সভ্যতা অর্থাৎ প্রকৃতি কেন্দ্রিক, প্রকৃতি নির্ভর যে জিনিসটা সেই জিনিসটা থেকে shifted হয়ে গিয়ে industry নির্ভর হয়ে যাবে। আর এটা হয়ে গেলেই লোকসঙ্গীত লোপ পেয়ে যাবে। থাকবে শুধু এই খোলসটা।

তাহলে কি এরকম বলা যায়... আপনারা যখন সংগ্রহ করেছেন আর আমরা যখন এখন সংগ্রহ করছি আমাদের কাজটা কি কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে ?

তোমাদের কাজ কঠিন হবেই। ওটা Archaeological কাজের মতো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে folk song বার করা। তবেই জিনিসটা দাঁড়াবে। সেই ধৈর্য্যটা কি তোমাদের থাকবে ?

সেটা সময়ই বলবে

সময়ই বলবে একমাত্র। তোমরা কতদিন পারবে ? তারপরে মনে হবে কিজন্য করছি ? কেন করছি ? কার জন্য করছি ? এটা হচ্ছে কারণ তুমি পরিবেশন করছ কার কাছে ? শহরের মানুষের কাছে লোকসঙ্গীত মানে folk song. খুব সহজেই বলে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত জানি, আমি নজরুল গীতি জানি, আমি folk song জানি (হাসি)...

মানে খুব সহজ। ওটার জন্য খুব কিছু করতে হয় না। শিখতে হয় না, জানতে হয় না, কিছু কপি করে নিলে হয়।

এখন তো রবীন্দ্রভারতীতে বহুদিন এই কোর্সও আছে

কিন্তু লোক সঙ্গীতের আসল মর্মটা এবং আরবান সংগীতের সঙ্গে তার পার্থক্যটা কোন জায়গায় সেটা বুঝতে হবে। এমনকি আজকালকার কলকাতা শহরে তো এরকম কথাবার্তা শুনি যে 'শহুরে লোকসঙ্গীত'- এ কি জিনিস। শহরের মানুষ করছে আরবান folk song. তার মানে আমেরিকানরা বলে যে You are folk, I am a folk - অতএব আমরা যা গান গাইছি তা folk সঙ্গীত এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে, ultimately এই জাতীয় জায়গায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, তাই হবে।

আপনার কি বিশেষ কোনো suggestion থাকবে এখানকার collector দের কাছে ?

না আমার কোনো suggestion নেই কারণ ওটা inevitable আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখেছি - কাজ করেছি একটা সময় পর্যন্ত তারপরে, ঐ মানুষের যখন কোনোসময় শিকড়ের টান হয় কখনো জানতে চায়। তার জন্য যদি সংগ্রাহকরা সংগ্রহ করে রাখে এটি তাদের কাজে লাগবে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ওটা একটা বিনোদন ছাড়া ওটার মধ্যে কোনরকমের...

ঐ প্রথম দলের মানুষদের কথাই বলছি

তার সংখ্যাটা খুব কম।

কিন্তু তারা যদি আগের জিনিস দেখতে যায় সেই জিনিসগুলো তো ধরে রাখার একটা ব্যাপার আছে - তার পদ্ধতিটা কি হবে

গ্রামে এখনো যারা বয়স্ক লোকজন আছে। ইয়ং যারা মানে খুব বাজারী গান গায়, গলা খুব আছে... চড়চড়ে গলা - রেকর্ডিং খুব ভালো - একটু আধটু জানে টানে এইটা বাদ দিয়ে -

যেসমস্ত লোক সত্যিকারের লোকসঙ্গীত গাইয়ে যারা practically প্রতিষ্ঠিত নয় অথচ মাটির গন্ধ আছে তাদের কাছ থেকে যে সংগ্রহটা হবে সেটাই কিন্তু আসল সংগ্রহ। তাতে কথাগুলো পাচ্ছ, মানেগুলো পাচ্ছ, পরম্পরাগুলো পাচ্ছ, অর্থগুলো পাচ্ছ, সুরের structure পাচ্ছ, তত্ত্বটাও তারমধ্যে আছে। Younger generation -এর মধ্যে ওটা নেই ! কারণটা হচ্ছে সে গানটা এনে বাজারে ছাড়ছে। বাজারে যেটা চালু, চাহিদা বেশী ঐ অনুযায়ী ব্যাপারটা হচ্ছে। কাজেই Younger generation এর কাছ থেকে নিও না একেবারে পরিষ্কার।

আমি বাংলাদেশ কখনো যাই নি

বাংলাদেশে আমার নিজের experience হচ্ছে ওদেশের লোক practically জানেই না। সেখানে রনজিৎ সিংহ গেছে। সুনামগঞ্জে গান যখন নিচ্ছে তখন বলছে এইসব গান আপনারা কোথায় পান ? তারা নিজেরাই জানে না, বলে কেন এখানেই তো পেয়েছি।

বলে আমরা টিভি তে তো শুনি না।

এসব শহুরে লোকেরা বলছে...

শহুরে লোকেরা, ঢাকার লোকেরা এবং যারা গ্রাম্য গান গায়, সিলেটের লোক।

আমার কিছু ফকিরদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওখানকার তারা কেউ কেউ কখনো কলকাতায় আসেন তাদের সঙ্গে আমার কথা বলে মনে হয়েছে এখনো হয়তো পুরানো গান খোঁজাটা ওখানে সহজ হবে বেশী এখনকার চেয়ে এই ধারণাটা কি ঠিক ?

আমার কাছে তা মনে হয় না। ওখানে একটু গোলমালের ব্যাপার আছে। ওখানে মৌলবাদীদের ব্যাপারটা খুব প্রচন্ড ফকিরেরা কোণঠাসা। ওদের মধ্যেও কিন্তু একটা প্রতিযোগিতা কাজ করছে forefront -এ আসা। শহরের মিডিয়ার কাছে, বৈদ্যুতিন মিডিয়ার কাছে আসা। সেখান থেকে খাঁটি বার করাটা বেশ শক্ত কাজ. যদি না তলায় তলায় গিয়ে কাজ করা যায়।

যেমন আমরা বাঁকুড়ায় গান সংগ্রহ করতে গেছি প্রচন্ড সাহায্য করেছে সবাই। তারা বলেছে পটল বলে একজন আছে কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের দেখা হল না। কিন্তু পটলের জাতীয় গান যাদের কাছ থেকে শুনলাম সেটা আমাদের নয়, লোকসঙ্গীত নয়।

আমরা সংগ্রহ করলাম। কিন্তু লাভ হল না। এমনকি আরো যারা লোকসংগীতে উৎসাহী, ভাদু গান করছে। 'সিদ্ধার্থ রায় গো - তুমি বলেছিলে বিদ্যুৎ এনে দেবে - তুমি মায়ার মায়ায় ভুলে থাকলে' এই হলো কথা। আমরা রেকর্ড করে যাচ্ছি। বন্ধও করতে পারছি না। লেখার ভান করছি কিন্তু বন্ধও করতে পারছি না। সমস্ত ফেলে দিয়েছি কারণ ওগুলো লোকসঙ্গীত নয়। ওটা আমাদের on the spot আমাদের ঠিক করতে হচ্ছে - যে আসল লোকসঙ্গীত কোনটা। ওখানে যে pollution টা চলে গেছে গ্রামের মধ্যেও pollution টা চলে গেছে।

(এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে সিদ্ধার্থ রায়ের কথা বলে)

ওটা লোকসঙ্গীত নয় ওটা current issue।

কিন্তু লোকসঙ্গীত বলতে শুধু পুরানোটাই হবে নাকি নতুন যা লিখছে

যে কারণে ভাদু গানটা ভাদু হলে - সেটা হলো না। ভাদু গান দিয়ে যদি এখন আমি ছড়া তৈরী করি তাহলে সেটা ভাদুগান হলো না। ওটা parody হলো। তো সেইটে না করে parody না করে academically জানতে হবে কারণটা কি। আমি যখন টুসুর গান সংগ্রহ করব তখন টুসু গানের আসল কারণটা কি - কেন টুসু - তুষ থেকে এলো - ধানের তুষ থেকে এলো। পৌষমাসে কত ধান হলো তার পুজাটা হচ্ছে একটা হাঁড়ির মধ্যে। চোখ এঁকে হাঁড়ির মধ্যে তুষ ভর্তি করে ফুল টুল দিয়ে গান গাওয়া। তারপর মকর সংক্রান্তিতে ভাসিয়ে দেওয়া। বেশীর ভাগই অল্প বয়সীরা করে। কত ধান হলো তুষ দিয়ে প্রমাণিত হলো গানে এতো তুষ দিয়ে কতটা চাল। মানে এটা হচ্ছে চাষীর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত জমির সঙ্গে (তুষ), সেখান থেকে যদি কিছু বলে আমি মমতা ব্যানার্জীর অনশন যদি থামিয়ে দিতে চাই... এটা কারেন্ট হতে পারে... লোকসঙ্গীতের সুর নিয়ে আমি একটা কাজ করলাম বা parody তৈরী করলাম কিন্তু ওটা লোকসঙ্গীত হলো না। লোকজীবনের যে আশা-আকাঙ্খা সেইটে এলো না। লোকজীবনের যে আশা আকাঙ্খা সেখানে টাটার মোটরগাড়ি নেই, সে জমির মধ্যে ধান চাইছে, নিজের মাটির বাড়িতে থাকতে চাইছে। ভালো করে থাকতে পারবে, তার পরিবেশকে সে অস্বীকার করছে না। সে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে শহরে আসতে চাইছে না। গ্রামে rooted থাকতে চাইছে। এই যে সেখান থেকে যে কথাগুলো বেরিয়ে আসে সেটা কিন্তু প্রকৃতি নির্ভর - প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে নয় এগুলোকে যেই বাদ দিলাম রাজনৈতিক হয়ে গেল সামাজিক হয়ে গেল বা অন্যরকম হয়ে গেল সাহিত্যিক আবেদন থাকতে পারে তার মধ্যে...কিন্তু সেটা লোকসঙ্গীত হল না।

আপনাদের সময়ে গণনাট্যের সময় - মানে 'শিখরের' সময় ৪০ দশক বা কিছুটা ৫০এর দশক সেই সময় যে একটা প্রবণতা ছিল যে বিনয় রায়, বটুক দা, অতটা নয় এবং বিজন ভট্টাচার্য, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ওরা যে লোকসঙ্গীতের সুরে রাজনৈতিক কথাবার্তা প্রচারের একটা চেষ্টা করেছিলেন সেটা কি শেষ পর্যন্ত খারাপ প্রমাণিত হয়েছে।

নাঃ খারাপ কিছু নয়। কিন্তু এটার কোনো impact হলো না। এটা হচ্ছে শহরের উপরে গ্রামীণ সংস্কৃতি এনে দেওয়া হল। দেওয়া হচ্ছে একটা গ্রামীণ মোড়কে। গ্রামীণ মোড়কে আমি আমার কথাটা বললাম। এর জন্য আয়ুটা বেশীদিন নয়। ওটা IPTA -র বাইরে কেউ গায় না। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান 'কাস্তেটারে দিও জোরে শান কিষাণ ভাইরে' এর মধ্যে একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। এক কিষাণ আরেক কিষাণকে সম্বোধন করে ভাই বলে না। এটা শহুরে মানুষেরা বলে - ভদ্রমহোদয়গণ, মহিলাগণ এবং মজদুর ও চাষী ভায়েরা। জাতে তোলা হল। মজদুর চাষী বললে কিন্তু হবে না। ভায়েরা বলতে হবে। এটা শহুরে ব্যাপার। আমি বলছি না যে তার মধ্যে dishonesty আছে। সেটা আমি বলব না। কিন্তু সেটা সহজ উপায়ে কিছু করার চেষ্টা।

আমি বলব বটুকদা সে তুলনায় অনেক ভালো। কারণ শহরের সংস্কৃতি, শহরের আবহাওয়ায় যেটা হয়েছে শহুরে মানসিকতায় সেইটা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গানে কিন্তু অন্যদের গান আমরাই গেয়েছি, আমরাই শুনেছি, কিন্তু আমাদের বাইরে আর কেউ গায় নি। ছড়ায় নি গানটা। ওটার গাওয়ার কোনো গায়ন নেই। issue ভিত্তিকি তো। একটা issue এসেছে। তেভাগা এসেছে, তেভাগার ওপরে গান হলো। ওই ধান মজুতদারী হয়েছে, ধান মজুতদারীর ওপর গান হলো। গরীব দেশবাসী, গরীব কিষাণ ভাই 'সোতে করলিরে ফসল সেই ফসল কাটিয়া নিল মজুতদার বাটপাড়ে গরীব কিষাণ ভাইরে' আসল গানটা হচ্ছে - নানাডোগরার ব্যাটা রে... উত্তর বঙ্গের গানের parody টা হলো। এই যে parody টা আমরা বেশীরভাগই করেছি। সুরটা নিয়েছি। নিয়ে করেছি। আমাদের ওই পটলের দোরমার মতো পুর ঢুকিয়ে দিয়েছি। মাংসের পুর হলে মাংস, ক্ষীরের পুর হলে ক্ষীর, পটলটা কিন্তু পটলই থাকলো বাইরে থেকে।

আমাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে আমরা এখন বাউল ফকির গানেই concentrate করছি তো আমার মনে হয়েছে যে ওদের যে আখড়াগুলো আছে সেখানে বছরে একটা করে উৎসব হয়...

সে তো ওরা করে মোচ্ছব বলে

এখন সেই মোচ্ছব গুলোকে যদি একটু টিকিয়ে রাখার ব্যাবস্থা করা যায় কিছু করে...

লাভ নেই। ওটা corrupted হয়ে যাবে। মনে হবে বাবুরা সব টাকার ব্যবস্থা করবে, সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করবে, আমরা একটু গান গাইলাম।

নতুন composer চাই তো। গান তো সেই পুরোনো। Young generation সেই composer এর মধ্যে আসবে না। সেই মানসিকতার মধ্যে আসবে না। সে তো সেই পোশাক-আশাকের দিকে নজর রাখছে। গানের technique -এর দিকে নজর রাখছে। record বা CD বেরোলো কিনা সেদিকে নজর রাখছে। corrupt হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ওই উৎসব গুলোতে এখনো কিছু পুরানো লোক আসেন...

হ্যাঁ - উৎসব গুলোতে এখনো কিছু লোক আসে। তারা অভ্যাসবশতঃ আসে কিন্তু ধর কেঁদুলী মেলা। কেঁদুলী মেলায় কি হয়। কেঁদুলী মেলা কি ছিল ?

আমি তো যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি...

তবে, কারণ ওরা নিজেরাই corrupt হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এখন হচ্ছে কতো শহুরে লোকের কাছে আমি ইয়ে করব।

আগে ভিক্ষে করে চালাতো। এখন বায়না করে - কত টাকা দেবেন - সেই অনুযায়ী গান গাইব একেবারে শহুরে রীতি অনুযায়ী চলেছে, কাজেই corrupt হয়ে গেছে এবং হবে। সেটা inevitable এটাকে আটকানো যাবে না। তার মধ্য থেকে নির্যাস যতটুকু ছিল নিতে হবে। নতুন করে কিছু আসবে না, তার কারণ industry বাড়বে, industry বাড়লেই গ্রামের মানুষ শহরের দিকে চলে আসবে। রোজগারের জন্য। যেই আসবে তখনি প্রকৃতির থেকে দূরে চলে যাবে। আর প্রকৃতির থেকে দূরে যাওয়া মানেই লোকসঙ্গীতের যে প্রাণ সেটা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে যাবে। তখন ওটা থেকে যাচ্ছে relic হিসাবে।

একটু আপনার ছোট বেলার কথা সিলেটে শা জালালের আখড়া বা হাসন রাজার গান যে আপনারা শুনতেন...

আমি দেখতাম তখন কিন্তু আমি এসবে আকৃষ্ট ছিলাম না। দেখতাম উরস যখন হত অর্থাৎ জালালের জন্মদিন বা মৃত্যুদিন উপলক্ষে যাই হোত সেই সময় ফকিররা দরগার পেছনে একটা খালি জায়গা আছে, অনেকটা জায়গা, সেখানে ফকিররা এসে বসত-থাকত গান গাইত গাঁজা খেতো এবং ঐখান থেকে প্রসাদের মতো খাবার, বড় বড় হাঁড়িতে ঢালাও রান্না হত সেইটা খেতো - যতদিন উরস থাকতো ৩ দিন গান গাইত। মারিফতী গান, নানা জায়গা থেকে দরবেশ - ফকিররা আসত, তখন যারা সমস্ত এই গান গাইত সবাই খাঁটি ছিল। তার চ্যালা চামুন্ডা ছিল না। ৬০-৭০ বছর আগেকার কথা বলছি, ১৯৪২-৪৩ ওই সময়কার। ঐখানে রণেন রায়চৌধুরী গান শেখে। গাঁজা খেয়ে খেয়ে ওদের কাছে গান শেখে। এবং মাঝে মাঝে ফকিররা আসত - তখনো যে ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় ফকিরকে ডেকে নিয়ে আসা হলো গান শুনতে এ ব্যাপারটা চালু ছিল না। যার দরকার সে গিয়ে শুনতো। এখন যেমন হয়েছে কিনা ওই রায়চৌধুরীর বাড়িতে দেখা গেল-নিতাই খ্যাপা এলো। আমার বাড়িতে বাউল গান হবে আপনারা আসুন অনেক খাওয়া-দাওয়া, সবাই গোল হয়ে বসল তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করল, এই ধরণের ব্যাপারটা ছিল না।

যে কারণে কীর্তনটার বারোটা বেজে গেছে। যে কীর্তনটা ছিল... কীর্তন মানে বর্ণনা - একটা কাহিনী বা কালকে বর্ণনা করা হচ্ছে কীর্তন। কীর্তন মানে সুর structure কিছু নয়। কিন্তু ওই বর্ণনাটা যদি এমনি বর্ণনা তাহলে খুব drab লাগবে তাই একটা সুর লাগানো সেইটা যখন

চৈতন্যদেব করেন তখন নদীয়া অঞ্চল থেকে যে লোকসঙ্গীত সেই সুরে গান হত। কিন্তু সেটা বাউলরাও গায়। simple সুর যাকে বলে। পরবর্তীকালে ঐ কীর্তনটা বাবুদের বৈঠকখানায় হয়ে গেল এবং তখন সাড়ে ছাবিবশ মাত্রা, সাড়ে তেত্রিশ মাত্রা, অমুক-তমুক সে মানে বিরাট ধারণা। পেনেটি ঘরানা অমুক ঘরানা হয়ে গিয়ে কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত ? কিছুই দাঁড়াল না আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে গেল। কারণ ওই সাড়ে ছাব্বিশের লোক শেষ হয়ে গেছে আর নতুন করে বুড়ো যারা তারা কিন্তু oldage home খুঁজছে। ছেলেপুলেরা এখন বুড়ো বাপমায়ের জন্য হোম খুঁজছে, তারা এসব practice করে না, কিছুই করে না। কাজেই ওটা লোপ পেয়ে গেছে। হরিকীর্তন মধ্যপ্রদেশে আলাদা সুর (আমাদের ঝুমুর ও আলাদা সুর)। রাজস্থানের যে কীর্তন বা পাঞ্জাবের যে কীর্তন তার সঙ্গে আমাদের কীর্তনের কোনো মিল নেই কিন্তু কীর্তন মানে বর্ণনা। ন্যারেট করা। ন্যারেট করার একটা একঘেয়ে সুর আছে তার একটা সুর structure আছে। সেইটি প্রত্যেকটি অঞ্চলে আলাদা। কথাটা কমন হচ্ছে কীর্তন। রাজস্থানের যে কীর্তন হচ্ছে বাংলার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

কিন্তু নামটা আছে ?

(হাসি)..... নামটা আছে। আমি তো শুনেছি। তিজন বাঈকে দিয়ে কীর্তন গাওয়ালাম। বললে ইয়ে কীর্তন হ্যায়। দেখলাম বিলাবল ঠাটের উপর যে কীর্তন করছি সেই কীর্তন নয়। এই জিনিসগুলোকে একটুখানি বোঝা দরকার। বুঝলে কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাবে। সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রটা পাল্টায়। শহুরে একটা জিনিস হচ্ছে... লোকসঙ্গীতের যেটা হচ্ছে simplicity... মৃত্তিকা ঘনিষ্ঠ যাকে বলা হয়, মাটির থেকে উঠে আসা পারিপার্শ্বিক থেকে structure তৈরী হওয়া তার ভাষার থেকে structure তৈরী হওয়া। যেমন কথ্য ভাষা হতে সংস্কৃত ভাষা এসেছে। সংস্কৃত আগে তৈরী হয় নি। আগে ফুল ফোটে না। পরে গাছ হয় না আগে গাছ হয় পরে ফুল ফোটে।

Primitive মানুষ কিন্তু সংস্কৃত ভাষা তৈরী করেনি। আকার ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করতে করতে ভাষা তৈরী হল ভাষাটা আস্তে আস্তে ছাঁকতে ছাঁকতে সংস্কৃত ভাষা হল। সংস্কার হতে হতে সংস্কৃত হল। এখন এটা হবে। তার মধ্যে সংস্কারের পথে নানা রকম বাধা বিঘ্ন হবে। এই যে industrialisation হচ্ছে তার সুফল আছে - কুফল আছে। industry আমি চাই না চাই হবেই। তার সুফল আছে, কুফল আছে। এখন সুফলটা হচ্ছে মানুষে কাজ করবে, চাকরী পাবে। কুফলটা হচ্ছে যে সে তার সংস্কৃতি হারাবে। ওই যে ভীষণ পার্থিব হয়ে যাবে।

With best compliments from

Amrit Group of Industries
9, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata 700 017 Phone: 2283 4581
E-mail: aplkolkata@dataone.in Website: www.amritprojects.in

AMRIT
GROUP OF INDUSTRIES

SPACE DONATED BY

A

WELL

WISHER

দেহতত্ত্বের গান ও বাউল-ফকির সম্পর্কে দু'টো-একটা কথা

সুরজিৎ সেন

'এলেম আমি কোথা হ'তে?' দেশ-কাল-ভাষা সমাজের সীমানা পেরিয়ে মানুষের এ এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। এ প্রশ্নেরই পথ ধরে বহুদূর হেঁটে সাধু-সন্ত-মরমিয়ারা এসে পৌঁছন নিজেরই কাছে বা বলা যায় নিজের দেহের কাছে। বুঝতে পারেন জানতে হবে দেহকে, কেননা দেহ থেকেই তাঁরা জন্মেছেন, পেয়েছেন দুর্লভ মানবজন্ম। তাই এই মানবজন্মকে বৃথা নষ্ট না করে দেহকে জানার মধ্য দিয়ে, দেহসাধনার সাধনে তাঁরা প্রেম-মুক্তি-আনন্দ আর অনন্তর সন্ধান করেছেন। প্রতিবাদ করেছেন জাতপাতের সংকীর্ণতা আর সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে ছড়িয়েছে তাঁদের শরীর ভাষার নিয়ম-নীতি-ব্যাকরণ আর গানে গানে ছড়িয়েছে সেই ভাষারই গুণকীর্তন, যে ভাষা জানা না থাকলে এ গানের প্রকৃত অর্থ জানা যাবে না।

এ মৌখিক ঐতিহ্য কত বছরের পুরনো তা জানা যায়না। তবে এর লিখিত রূপের কাল ধরলে চর্যাপদ (তিব্বতী ভাষায় লেখা দেহতত্ত্বের কবিতা ও গান) কে একটি মাইলফলক মানতে হয়। চর্যাপদের প্রথম কবি সরহপা-র কাল হ'ল খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী। তাহলে একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যাচ্ছে যে, বারোশো বছরের পুরনো এই দেহ সাধনার ধারা। তিব্বত থেকে এ ধারা বাংলায় আসে ও তামিলনাড়তে যায়। সেই সময় বৌদ্ধধর্মের কারণে তিব্বত ও বাংলার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, যাতায়াতও তত দুর্গম ছিল না। সুতরাং চর্যাপদের হিসেবে বাংলায় দেহসাধনার ধারা অন্তত হাজার বছরের পুরনো বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। চর্যাপদ থেকে আরও জানা যাচ্ছে, যে, ঐ দেহসাধকরা ছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষ, পেশায় তাঁরা জেলে, জোলা, মুচি, ডোম, কাঠুরে ইত্যাদি। আজও বাংলার গ্রামে শ্রমজীবী মানুষকেই দেখি দেহসাধনার সাধক রূপে।

আল্লা কী বা আকার কীইবা বস্তু

কর আগে তার নির্ণয়

মাবুদ (পূজণীয়) মজুদ আল্লা এই দেহেতে রয়।

এই দেহের মালিক রব্বানা

কোন মোকামে তার বারামখানা

তার সঙ্গে নাই দেখা শোনা

থাকি এক জায়গায়

মাবুদ মজুদ আল্লা এই দেহেতে রয়।

বস্তুর যদি না হয় পরিচয়

তবে চিনি বওয়া বলদের প্রায়

বহে বোঝা লজ্জত (স্বাদ) না পায়

ফকির দুদ্দু তেমনি প্রায়

মাবুদ মজুদ আল্লা এই দেহেতে রয়।

ঘরের দাওয়ায় বসে নজরুল ফকির যখন শূণ্যে একতারা তুলে এই গান করেন, তখন তাঁর শরীরের ভাষা বুঝিয়ে দেয়, যে, তিনি এমন এক আলোর সন্ধান পেয়েছেন এই গানের মধ্যে যা তাঁকে প্রতিদিন বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়। বছর তিনেক আগে বহরমপুর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে লালনগরে নজরুল ফকিরের বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। নজরুল বলেন, আমাদের একটাই তত্ত্ব, মানুষতত্ত্ব। মানুষকেই আমরা ভজন করি, পুজো করি। ঈশ্বর একজন আছে ঠিকই তবে সে কী আকারে, কী ব্যাপারে তা নিয়েই আমাদের নাড়াচাড়া-আলোচনা। গুড়ে যেমন মিষ্টি মিশে আছে - দুধে যেমন মাখন মিশে আছে - সেরকম ঈশ্বরও মানুষের সঙ্গে মিশে আছে। কেউ আলাদা করতে পারবে না। নবি, আদম এবং খোদা - এই আলাদা নয়। আদম অর্থাৎ মানুষকে যদি সেজদা (শ্রদ্ধা) করা যায়, তরে তার মূল বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হবে। যেমন দুদ্দু শাহ তাঁর গানে বলেছেন, বলে রহস্যের হাসি হেসে যে গান ধরেন তার উল্লেখ শুরুতেই করেছি।

পশ্চিমবাংলার নিম্নবর্গের লোকসমাজের এক অংশ এই দেহতত্ত্বের গান গেয়ে থাকেন। তুর্কী ভাষা থেকে আসা 'ফকির' শব্দটির মূল অর্থ নিঃস্ব মানুষ এবং বিশিষ্ট উপাসক সম্প্রদায়কে বোঝানো হ'ত। তুর্কীস্তানে এবং অন্যত্র নানাবিধ ফকির উপাসক সম্প্রদায়, তাঁদের বিশিষ্ট মতবাদ, নাচ ও গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখনো বেঁচে রয়েছেন। দরবেশ এবং সুফিদের সঙ্গেও এরা মিলে মিশে গেছেন। ফকির, দরবেশ, সুফি এখন সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। বাংলাভাষায় 'ফকির' শব্দটির অসাম্প্রদায়িক অর্থ হচ্ছে (ক) ভিক্ষুক (খ) সাধনার জন্য অর্থ-বিত্ত-সমাজ পরিত্যাগ করে যে নিঃস্ব হয়েছে (গ) রস-রতির গুহ্য সাধনাকে লালন 'ফকিরি' বলেছেন।

হিন্দু বা মুসলমান পরিচয়কে অস্বীকার করে যাঁরা নিজেদের 'মানব' সম্প্রদায় বলে পরিচয় দেন, তাঁরা নিজেদের বাউল বা ফকির বলে পরিচয় দিতেন, নিজেদের অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাসকে তুলে ধরার জন্য। কিন্তু ধর্মীয় বিভাজন তীক্ষ্ণ হতে থাকায় এবং তৃতীয় সমাজ গড়তে ব্যর্থ হওয়ায় বাউল-ফকিরেরা হিন্দু বা মুসলমান সমাজে বাস করতে বাধ্য হন। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহে তাঁরা নিরুপায় হয়ে যে কোনো একটি সাম্প্রদায়িক সমাজবিধি মান্য করে চলেন। বাউল-ফকিরের

সাধনা গৃহকর্মের সাধনা। কিন্তু বৈদিক/শরিয়তি জীবনচর্যার সঙ্গে এঁদের প্রবল বিরোধ। তাই শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ধর্মীয় সমাজের মধ্যে এক গুহ্য সমাজ নির্মাণ করে এঁরা বাস করেন। এঁরা প্রচলিত ধর্মকে অমান্য করেন, অত্যাচারিত হন এবং আঘাতকে পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করে সমাজের প্রান্তবাসী জীবনকে বেছে নেন। মুসলমান সমাজে এঁরা 'বেশরা' অর্থাৎ যাঁরা শরিয়ত মানেন না আর হিন্দু সমাজে এঁরা 'পঞ্চম বর্ণ' বলে চিহ্নিত অর্থাৎ যারা চতুর্বর্ণের ধর্ম মানে না।

বাউল-ফকিররা দেহতত্ত্বের গান গেয়ে থাকেন। এই গানের মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন দেহতত্ত্বের কথা প্রচার করেন অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। এঁরা প্রণাম করেন মানুষকে। কেননা ঈশ্বর আছেন এই দেহতেই। সেই দেহ ঈশ্বরের সাধনাই এঁরা করেন। দেহতত্ত্বের অধিকাংশ গান লালনের লেখা। লালনের শিষ্য দুদ্দু শাহ ও পাঞ্জু শাহ - এঁরাও অনেক দেহতত্ত্বের গান লিখেছেন। এছাড়া অন্যান্য পদকর্তার লেখা দেহতত্ত্বের গানও এঁরা গেয়ে থাকেন। এঁদের গানে শরীরের মধ্যেই ঈশ্বরকে খোঁজার আকুতি আছে, রজঃবীজে নির্মিত এই দেহকেই জানার ইচ্ছে আছে। আত্মতত্ত্বে আপ্ত বা সিদ্ধ হবার চেষ্টা আছে।

ফকিরদের জীবনযাপনে নক্সাবন্দী সুফিগোষ্ঠীর সাধনা, সোহাগী (সুফি গুরু মুসা সোহাগের অনুসারীরা) সুফি গোষ্ঠীর নারীভাবনা, মারফতি ঐতিহ্য ইত্যাদির প্রভাব দেখা যায়। লালন তাঁর গানে যে রসতত্ত্ব বা ফকিরি সাধনার কথা বলে গেছেন বা তাঁর আমল থেকে গত একশো বছর বা তার কিছু বেশি (লালনের মৃত্যু হয় ১৮৯০ সাল) সময় ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় যে দেহ সাধনার ধারাটি চলে আসছে ফকিরিপন্থায়, ফকিররা সেই সাধনার বিভিন্ন স্তরে নিজেদের সাধ্যমত পৌঁছনোর চেষ্টা করেন। ইতিহাসে রস সাধনার সিদ্ধ পুরুষ হিসেবে কৃষ্ণ, চৈতন্য, মহম্মদ এঁদের নাম পাই। এ সাধন ঐতিহ্য ইসলামে, বৈষ্ণবে, চৈতন্য ধর্মে (চৈতন্য যে ধর্ম প্রবর্তন করেন), আগমে (শাক্ততন্ত্রে), নিগমে (শৈবতন্ত্রে), ভক্তি আন্দোলনে বহু যুগ ধরে গুপ্ত গুরুমুখী বিদ্যা হিসেবে চলে আসছে। এ সাধনা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়। এ সাধনাটি যে কোনো মানুষের পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব। আর নিজে অভ্যাস করে জানাই - এ সাধনায় প্রবেশের একমাত্র পথ। প্রচলিত ধর্মাচরণ, সাজ-পোশাক, খাদ্যাখাদ্যের বিধিনিষেধ এ সাধনায় অবান্তর। যে কোনো জাতি বা ধর্ম গোষ্ঠীর, যে কোনো সাবালক মানুষ স্বেচ্ছায় একজন গুরুর কাছে নারী-পুরুষ যুগলে বা এককভাবে সাধনা শুরু করেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী, ধর্ম থেকে আসা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ গুরুকে কেন্দ্র করে এক শিথিল সংগঠন গড়ে তোলেন। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপন স্বাতন্ত্র্যে আবার শিষ্য করেন, নতুন মন্ডলী গঠন করেন। এভাবেই কোনো সম্প্রদায় ছাড়াই ঢেউয়ের মত 'গুরু জাতীয়' ধর্ম সমাজে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বাউল ও ফকিররা পরলোক, মোক্ষ, মুক্তি, বেহেস্ত বা স্বর্গে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বর্তমান পন্থায় বিশ্বাস করেন। বর্তমান পন্থা অর্থাৎ যা চোখে দেখা যায়। মানুষকে চোখে দেখা যায়,

তাই মানুষই ঈশ্বর। তাঁরা মনে করেন যে মানুষের শরীর থেকে যদি মানুষের জন্ম হয় তা হলে মানবজন্মের পিছনে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই। আর যদি মানবজন্মের প্রক্রিয়াই ঐশ্বরিক ব্যাপার হয় তাহলে সে ঈশ্বর মানুষের শরীরের ভেতরেই আছে। বাউল-ফকিররা নিজেদের বর্তমানপন্থী বলেন, বর্তমানপন্থীরা মনে করেন, যে, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন নি, মানুষই ঈশ্বর কল্পনা করেছে। যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন অর্থাৎ শরিয়তিরা, তাঁদেরকে এঁরা অনুমানপন্থী বলেন। অর্থাৎ যাঁরা অনুমান করেন বা আন্দাজ করেন যে ঈশ্বর বলে একজন আছেন। স্বর্গ-নরক আছে। জীবনে শরিয়তি ধর্ম পালনে পুণ্য অর্জন করলে - ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হবে - এ তাঁদের অনুমান। বর্তমানপন্থীরা নিজেদের অনুমানপন্থীদের থেকে আলাদা করেন সব সময়। এঁরা কৃষ্ণ, হজরত মহম্মদ এবং চৈতন্যকে মানুষ বলে মনে করেন। বর্তমানপন্থীদের এই মদবাদ গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে বস্তুবাদী দর্শন, আয়ুর্বেদ, দেহতত্ত্ব এবং কামশাস্ত্র। এঁরা মনে করেন না মানবদেহ পঞ্চভূতে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) তৈরি। এঁরা মনে করেন মানবদেহ চতুর্ভূতে (আব, আতস, খাক, বাত বা জল, আগুন, মাটি, বায়ু) আর রজঃবীজে তৈরি। এই দেহ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে এঁরা মান্য করেন। রসরসায়নের সাহায্যে দেহরক্ষণ ও দীর্ঘজীবন লাভের রসসাধনা এঁরা করেন।

বর্তমানে এমন একটা সময়ে আমরা বাস করছি, যখন ধর্মীয় মৌলবাদের চাপে মানবিক সম্পর্কগুলো নষ্ট হতে বসেছে, সেই সময় বাংলার এই প্রান্তিক মানুষেরা মৌলবাদের বিরুদ্ধে শরিয়ত অমান্য করে অত্যাচারিত হয় এবং আঘাতকে পুরস্কার ভেবে গ্রহণ করে। যেমন মুর্শিদাবাদের আবেদ ফকির, ফকিরি পথের পথিক বলে ধর্মীয় মৌলবাদীরা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গিনীকে মারে এবং ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে। এরপরে সে প্রশাসনিক সাহায্যে ও মনের জোরে গ্রামে ফিরে আসে। হাসিমুখে গায় *আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে। আমি জনম ভরিয়া একদিনও না একদিনও না দেখলাম তারে* - এই গান সমাজের অপর কণ্ঠস্বর। যে কণ্ঠস্বর সমাজের যাবতীয় আগ্রাসী কোলাহলের বিরুদ্ধে টিঁকে আছে। এঁরা ফকির, প্রকৃতই সর্বহারা। একমাত্র দেহটুকুই এঁদের নিজস্ব। দেহের মূল বস্তু পরিচালনার ভার গুরুকে দিয়ে এঁরা সর্বস্ব হারায়।

With best compliments from

48A, Taratalla Road (Near Nature Park)
Kolkata 700 066 India
Phone : (91 33) 2491 0889 / 0891/0893
Fax : (91 33) 2491 0892
Website : www.wabtec.com

With best compliments from

A

WELL

WISHER

বাউল-ফকির গানের সেরা পদকর্তাদের পরিচয়

লালন শাহ (১৭৭৪ (?) - ১৮৯০)

লালন ফকিরের পুরো নাম লালন শাহ দরবেশ। লোকমুখে লালন সাঁই দরবেশ। বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়া জেলার ছেঁউড়িয়ায় তাঁর আশ্রম ছিল। ১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর সেখানেই লালনের মৃত্যু হয়। তাঁর শিষ্যদের মতে তখন তাঁর বয়স ১১৬ বছর। কোনো লিখিত সাক্ষ্য না থাকায় তাঁর জন্ম সালটি বিতর্কিত। বাংলার বাউল-ফকির সাধনার দীর্ঘ ঐতিহ্যে লালন শাহের মতো মান্যতা ও তাঁর গানের মতো প্রসার আর কারোর হয়নি। তিনি ধর্মোপদেশ দিতেন না, মুখে মুখে গান বেঁধে শোনাতেন। সেসব গান তিনি লিখে রাখতেন না। লিখে রাখাটা বাউল-ফকিরদের রীতি নয়। তাঁদের বিশ্বাস প্রতিদিন নতুন প্রেরণা আসবে, নতুন গান উৎসারিত হবে। এই কারণে লালনের অসংখ্য গান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাঁর শিষ্যরা কিছু কিছু গান লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তাতে তাঁর সাড়ে পাঁচশোরও বেশি গানের হদিশ পাওয়া যায়। জনশ্রুতি আছে লালনের লেখা গানের সংখ্যা হাজারেরও বেশি।

দুদ্দু শাহ (১৮৪১-১৯১৯)

বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ার হরিশপুরে থাকতেন দুদ্দু শাহ। সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত দুদ্দু ছিলেন লালনের শিষ্য। ধর্মীয় বিতর্কের (বাহাস) সূত্রে লালনের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। লালনের কথায় মুগ্ধ হয়ে তিনি লালনের শিষ্য হন। এরকমই লোক পরম্পরায় শোনা যায়। লালনপন্থার তিনি শ্রেষ্ঠতম তাত্ত্বিক কবি, তাঁর লেখা লালন পরবর্তী বাউল তত্ত্বের খুব গুরুত্বপূর্ণ টেক্সট বলে বিবেচনা করা হয়। যুক্তিবাদে ও দেহতত্ত্বের প্রতি আনুগত্যে এবং বিভেদমূলক ধর্মকে তিরস্কারে তাঁর পদাবলী অসাধারণ।

কুবির গোঁসাই (১৭৮৭-১৮৭৯)

কুবির গোঁসাই জন্মেছিলেন নদিয়ার চুয়াডাঙা মহকুমার (বাংলাদেশ) মধুপুর গ্রামে। প্রকৃত নাম কুবের সরকার। কবিগানের দলের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে নদিয়ার বৃত্তিহুদা গ্রামে এলে, সেখানে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গুরুচরণ পালের কাছে দীক্ষা নেন। বিরানব্বই বছরের জীবনে বারশো-র বেশি বাউল ও ফকিরি গান লিখেছেন তিনি। আরবি-ফারসি মিশ্রণে ইসলামি গানও লিখেছেন কুবির। লালন সমকালীন এই গীতিকার ভাববৈচিত্র্য ও রচনা কুশলতায় অনবদ্য গান লিখেছেন। তাঁর দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন রাঢ়ের বিখ্যাত গীতিকার যাদুবিন্দু গোঁসাই।

যাদুবিন্দু গোঁসাই (১৮৪৫-১৯১৫)

বর্ধমান জেলার সমুদ্রগড়ের কাছে পাঁচলখি গ্রামে যাদুবিন্দুর সাধনক্ষেত্র ও সমাধি আছে। সাহেবধনী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সাধক ও গীতিকার কুবির গোঁসাই তাঁর গুরু এবং যাদুবিন্দুর সব গানের ভনিতায় কুবিরের নাম আছে। যাদুবিন্দু নামটির উৎস - তাঁর নাম যাদু এবং তাঁর সাধনসঙ্গিনীর নাম বিন্দু। তাঁর গানে রূপকবিন্যাসে দেহতত্ত্বের চমৎকার ব্যঞ্জনা আছে। রূপকপ্রিয়তা এবং অন্তর্লীন আধ্যাত্মিকতা যাদুবিন্দুর গানের সম্পদ।

পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪)

যশোহরের সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী বংশের সন্তান পাঞ্জু বাংলার মরমি গানে একজন উল্লেখযোগ্য পদকার। রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম, তাই গোপনে ফকিরিপন্থার চর্চা করতেন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ফকিরি গ্রহণ করেন। বহু গান রচনা ছাড়াও তিনি ইস্কে সাদেকী গওহার (১৯০৭) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সাধক ও পদকাররূপে পাঞ্জু শাহ লালনের মতোই মান্যতা পেয়েছেন।

দীন শরৎ (১৯০৩-১৯৬৩)

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার সাজিউড়া গ্রামে দীন শরৎ-এর জন্ম। শৈশবে নয় বছর বয়সে পাঠশালায় পড়তে পড়তে টাইফয়েড রোগে তিনি অন্ধ হয়ে যান। গান গেয়ে মাধুকরীতে তাঁর দিন চলত। গুরু - শিষ্যের প্রশ্নোত্তরের ধাঁচে (পাল্লা গান) দীন শরৎ-এর গান অতি প্রসিদ্ধ।

ভবা পাগলা (১৯০০-১৯৮৪)

ঢাকা জেলার ধামরাই থানার আমতা গ্রামে তাঁর জন্ম। পশ্চিমবাংলায় আসেন ১৯৫০ সালে। গৃহী সাধক। বর্ধমান জেলার কালনায় আশ্রম করে থাকতেন। এই অন্তর্মুখী সাধকের গান বাংলার গায়ক, সাধকদের কণ্ঠে ব্যাপক প্রচলিত।

হাসন রাজা (১৮৫৫-১৯২২)

হাসন রাজার নামের একাধিক রূপ পাওয়া গেছে। যেমন হাসন রাজা, হাসন রেজা, হাছন উদাস। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জের লক্ষণশ্রী গ্রামে হাসনের জন্ম। সামন্ত পরিবারের ভোগী পুরুষ হাসনের মনে হঠাৎ বৈরাগ্য দেখা দেয় এবং তিনি বাউল গান লিখতে শুরু করেন। হাসনের গানে আছে সিলেট অঞ্চলের বাগ্‌ধারা আর তার গায়ন পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। তাঁর লেখা ২০৬টি গান নিয়ে 'হাছন উদাস' নামে একটি সংগীত সংকলন আছে। তাঁর গানের মারফতি চিন্তার পরিচয় স্পষ্ট।

জালালউদ্দিন (১৮৯৪-১৯৭২)

বর্তমান বাংলাদেশের নেত্রকোনার কেন্দুয়া থানা অঞ্চলে জালালের জন্ম। অলি-আউলিয়ার মাজারে ও সাধু সঙ্গে দিন কাটাতে গিয়ে সুফি মতবাদে আকৃষ্ট হন এবং দেহতত্ত্বের গান লিখতে শুরু করেন। তাঁর লেখা প্রায় এক হাজার গানের সংকলন জালাল গীতিকা চার খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গুরু নেত্রকোনার বিখ্যাত সাধক-গীতিকার রসিদউদ্দিন। জালাল অত্যন্ত জনপ্রিয় গীতিকার এবং বলিষ্ঠ মতবাদের মানুষ, আরবাসউদ্দিনের মতো খ্যাতনামা গায়ক তাঁকে পিরের মতো ভক্তি করতেন।

: অনুষ্ঠানসূচী :

৬ই জানুয়ারী, ২০০৭

সকাল : দেবদাস, তারক দাস, উত্তম দাস, কার্তিক দাস, গৌর ক্ষ্যাপা
হারাধন দাস, সুবল দাস, কানাই মণ্ডল ও সত্যানন্দ দাস

বিকাল : মন্মথ বিশ্বাস, রাধাশ্যাম দাস, বেদানা ফকিরানি, হীরা শাহ,
কালাচাঁদ দরবেশ, খৈবুর ফকির, আরমান ফকির ও আক্কাশ ফকির

সন্ধ্যা : বিশ্বনাথ দাস, তারক দাস, কার্তিক দাস, কানাই মন্ডল,
তুলিকা হাজরা, গঙ্গাধর মন্ডল, হারাধন দাস, উত্তম দাস ও সুভদ্রা

৭ই জানুয়ারী, ২০০৭

সকাল : মনসুর ফকির, খৈবুর ফকির, গোলাম ফকির, আমিরুল ফকির
আরমান ফকির, বাবু ফকির, তুলিকা হাজরা ও গঙ্গাধর মন্ডল

বিকাল : বিশ্বনাথ দাস, গৌর ক্ষ্যাপা, গোলাম ফকির (মুর্শিদাবাদ)
হারাধন দাস ও বেদানা ফকিরানী

সন্ধ্যা : কালাচাঁদ দরবেশ, মনসুর ফকির, আক্কাশ ফকির,
গোলাম ফকির, সুভদ্রা শর্মা, হিরা শাহ ও সত্যানন্দ দাস

MARFAT

13/A Raipur Road East, Flat 6, Kolkata 700 032

Email : marfat_india@hotmail.com

Contact

Arup Das 94335 01217 • Partha Majumdar 98307 18403